মারাঠি নাটক ঃ অন্তরঙ্গ অনুসন্ধান

সাগর বিশ্বাস

১৯১৪ সাল । কলকাতার সংবাদপত্রে স্নেহলতা নামে এক বাঙালি গৃহবধূর আত্মহত্যার খবর প্রকাশিত হল । জানা গেল, স্নেহলতার দরিদ্র পিতা উপযুক্ত বর-পণ দিতে পারেনি বলেই এই পরিণাম । সেকালে পণপ্রথা এত ভয়ঙ্কর ভাবে সমাজজীবনকে গ্রাস করে রেখেছিল যেশ্বশুরবাড়ির নিরবচ্ছিন্ন অবহেলা ও অত্যাচার সহ্য করতে না পেরে অনেক গৃহবধূকেই আত্মহত্যার পথ বেছে নিতে হত । অন্যথায় মানসিক উৎপীড়ন ও শারীরিক বঞ্চনাকে মেনে নিয়ে জীবন্মৃত অবলা জীবনযাপন । স্নেহলতার বিয়োগান্ত কাহিনী সংবাদপত্রের পাঠকেরা দুদিন বাদেই ভুলে গেল । তারা জানতেও পারল না , সেই মুহূর্তে কলকাতা থেকে হাজার মাইল দূরে মহারাষ্ট্র রাজ্যে ওই আত্মঘাতী সাধারণ মেয়েটির অমরত্বের পরিকল্পনা চলছে । হ্যাঁ, স্নেহলতার আত্মহত্যার ঘটনায় বিচলিত ও অনুপ্রাণিত হয়ে মারাঠি নাট্যকার ভার্গবরাম বিঠল ওরফে মামা ওয়ারেরকার নাটক লিখলেন— 'হাচ মুলাচা বাপ' (ইনিই পাত্রের পিতা)। পণপ্রথার বিদ্ধে স্যাটায়ারধর্মী প্রথম মারাঠি নাটক (১৯১৬) ।

অনেকে মনে করেন মারাঠি নাটকে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে চল্লিশের দশকে । ১৯৪১ সালে বোম্বাই- এ অনুষ্ঠিত নাট্যসম্মেলন, ১৯৪৩ সালে সাংলিতে উদ্‌যাপিত শতবার্ষিকী উৎসব এবং সর্বোপরি দেশব্যাপী গণনাট্য আন্দোলনের তীব্র অভিঘাতেই নাকি সে আধুনিকতার অভ্যুদয় । এ বিষয়ে আমি কিঞ্চিৎ ভিন্নমত পোষণ করি । চল্লিশের দশক আমার কাছে একটি যুগান্তকারী তাৎপর্য নিয়ে আসে । গণনাট্য আন্দোলন সারা দেশের প্রচলিত নাট্যভাবনাকে (Concept) ওলট পালট করে দেয় । সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাসিবাদের বিদ্ধে এক নতুন নাট্যদীক্ষা দিয়ে যায় চল্লিশের উত্তাল দশক । তাকে নিছক আধুনিকতার শিথিল বন্ধনে আবদ্ধ করতে আমার আপত্তি আছে । আমরা বঙ্কিমচন্দ্রকে যে অর্থে বাঙলা সাহিত্যে আধুনিকতার ভগীরথ বলে বিশ্বাস করি, সেই অর্থে আমার মতে, মামা ওয়ারেরকারের ' হাচ মুলাচা বাপ' রচনার সঙ্গেই মারাঠি নাটকে আধুনিকতার সূত্রপাত হয়েছে । কারণ যে ভ য়ঙ্কর পণপ্রথা এখনও সমাজের বুকে চেপে আছে, মামা ওয়ারেরকার আজ থেকে ৮০ বছর আগে সেই সামাজিক সমস্যা মঞ্চে নিয়ে এসেছিলেন। শুধু পণপ্রথাই নয়, অস্পৃশ্যতা, অবিচার, নারীর অর্থনৈতিক পরাধীনতা, মদ্যপান, স্বৈরাচার ইত্যাদি কুসংস্কার ও অব্যবস্থার বিদ্ধেও তার বহু নাটক আছে । মারাঠি 'তামাশা'র আদিরসাত্মক ভাঁড়ামো এবং পৌরাণিক আধিপত্য থেকে প্রচলিত ।

'শান্ততা, কোর্ট চালু আহে' নাটক দুটিও ষাটের দশকের ফসল । কলকাতায় বহুরূপী প্রযোজতি 'চোপ, আদালত চলছে' নাটকটির কথা অনেকেরই মনে আছে । বস্তুত '৬৭ সালে রচিত এই নাটকটিই সর্বপ্রথম বিজয়ের বিজয়বার্তা ঘোষণা করে দেয় পুরস্কারে, জনপ্রিয়তায় । এই নাটকের জন্যই বিজয় কমলাদেবী চট্টোপাধ্যায় পুরস্কার লাভ করেন । একটি নারীহৃদয়ের পবিত্র বাসনাকে এই সমাজব্যবস্থা কী ভাবে বিধবস্ত করে চূড়ান্ত অসম্মানের মধ্যে ঠেলে দেয়, এ নাটক তারই এক নিষ্ঠুর আলেখ্য। অবশ্য সমালোচকদের মতে, বিষয়বস্তু ও আঙ্গিকের প্রশ্ন এর চেয়েও বলিষ্ঠ ও পরীক্ষামূলক মনোভাবের পরিচয় রয়েছে 'গিধাড়ে'র মধ্যে, যেটা শান্ততা '-রও অনেক আগে লেখা । আধুনিক ভারতীয় জীবনের লোভ, ঘৃণা, বিদ্বেষ ও বর্বরতা যেখানে পিতা-পুত্র-কন্যা সকলকেই শকুন পর্যায়ভুক্ত করতে পারে এরকম একশ্বাসরোধকারী গল্প নিয়ে এ নাটক । উত্তরকালীন নাটকে তেন্ডুলকার আরও নির্মম হয়ে উঠেছেন । সত্তর দশকে তাঁর 'মিত্রাচি গোসথা' 'সখারাম বাইন্ডার ', 'ঘাসিরাম কোতেয়াল ', 'কমলা' ইত্যাদি অসাধারণ মঞ্চসাফল্য অর্জন করে । সেন্সার প্রথাকে অগ্রাহ্য করে, প্রশাসনের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করে, সমালোচকের তি র্যকদৃষ্টি অগ্রাহ্য করে, একালের এই শক্তিমান নাট্যকার নিঃসন্দেহে মারাঠি মঞ্চে এক নতুন যুগের শুভমুক্তি ঘটিয়েছেন । দেশের বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর নাটক অব্যাহত গতিতে অভিনীত হয় । এবং এখনও পর্যন্ত মারাঠি নাট্যজগতে বিজয় তেন্ডুলকারই সর্বাধিক আলোচি ত ও বিতর্কিত ব্যক্তিত্ব । বর্তমান সমাজব্যবস্থার সহস্র পঙ্কিল আবর্ত, তার ঘুণধরা কাঠামোর অন্তঃসারশূন্যতা তেন্ডুলকার তথাকথিত শিল্পীর নির্মোহ দৃষ্টিতে দেখেননি । বরঞ্চ সুতীব্র জ্বালা এবং বিদ্রোহী চেতনায় সমাজে প্রচলিত মূল্যবোধের ভিতটাকেই সজোরে নাড়িয়ে দিতে চেয়েছেন । এজন্য অনেকে তাঁকে ভায়োলেন্ট বলেছেন । কিন্তু তথাকথিত ভায়োলেন্সকে শিল্পোত্তীর্ণ করা সহজ কাজ নয় । ঋত্বিক ঘটকের ভাষায় বলা যেতে পারে 'চিত্তের বিশুদ্ধতা ও ঘৃণার পবিত্রতা' না থাকলে এ ভায়োলেন্স আনা যায় না ।

কলকাতার দর্শক 'কমলা' দেখেছেন । কাজল চৌধুরী সমীর মজুমদার অভিনীত বাঙলা নাটকটি মঞ্চসাফল্য পেয়েছে । কলকাতার ক

াগজগুলিও অকুণ্ঠ প্রশংসা করেছে । কিন্তু মহারাষ্ট্রের মঞ্চে প্রায় তিন বছর নীরবতার পর তেন্ডুলকার যখন ‘কমলা’ নিয়ে আবির্ভূত হন তখন একটা মিশ্র অভিমত পাওয়া যায় । ‘কমলা’ সত্য ঘটনাকে ন্দ্রিক নাটক। ইন্ডিয়ান এক্সপ্রেসের সাংবাদিক অশ্বিনী সারিন একটি প্রতিবেদনে বর্তমান ভারতবর্ষের বাজারে নারী কেনাবেচার এক চাঞ্চল্যকর তথ্য প্রকাশ করেন । তথ্যের সপক্ষে সারিন নিজেই রাজস্থানের একটি গ্রাম থেকে কমলা নামে এক আদিবাসী রমনীকে দুহাজার তিনশ টাকায় কিনে নিয়ে আসেন। এই ঘটনাকে নিয়েই তেন্ডুলকারের নাটক। নাটকের সাংবাদিক জয় সিং যাদব মাত্র আড়াইশ টাকায় কমলাকে কিনেছেন বিহারের লোহারডাগা থেকে । শুতেই মনে হয় , জয়সিং আদর্শবাদী সামাজিক দায়বদ্ধ একজন সত্যানুসন্ধানী সাংবাদিক । কিন্তু দর্শকের ভুল ভাঙতে দেরি হয় না যখন দেখা যায় সে তার বৃত্তি ও পেশাগত প্রতিষ্ঠার জন্যই কমলাকে ব্যবহার করে । নিজের স্ত্রীর প্রতি সনাতন ভারতীয় পুষের উন্নাসিকতা ও প্রভুসুলভ আচরণ শেষ পর্যন্ত সাংবাদিককে একটি নেতিবাদী চরিত্রে পরিণত করে । মহারাষ্ট্রে নাটকটির নির্দেশনায় ছিলেন কমলকার সারং । বিত্রম গোখেল ও লালন সারং যথাত্রমে জয়সিং ও তার স্ত্রীর ভূমিকায় অভিনয় করেন । রোহিনী নিলেকামি প্রমুখ মারাঠী সমালোচকেরা অভিনয় ও পরিচালনার ভূয়সী প্রশংসা করলেও নাটকটির আঙ্গিক ও স্টাইলের দিক থেকে কোনও অগ্রসরতা লক্ষ করেননি । বরং ‘কমলা’র আগে লেখা ‘মিত্রাচি গোসথা’কে (পরিচালনা— বিনয় আপ্তে) কে অধিকতর পরিণত বলে মন্তব্য করেছেন অনেকেই । রোহিনী হাত্তাংগাদি (মিত্রা) এবং মঙ্গেশ কুলকার্নি (মিত্রার প্রেমিক) অভিনীত নাটকটির অভিনয়াংশও সমালোচকদের সহানুভূতি অর্জন করে । সাধারণ মারাঠি দর্শক কিন্তু এ নাটককে ব্যাপকভাবে গ্রহণ করেননি । একটি কলেজে পড়া মেয়ের জৈবিক ক্ষুধা এবং মানসিক একাকীত্বের অনুষঙ্গে যে জটিল নাটকীয় বৃত্ত ও বিভিন্ন চরিত্রের বিচিত্র মুল্যবোধ ও প্রতিত্রিয়া, তা খুব সহজ ও স্বাভাবিকভাবে তাঁরা গ্রহণ করতে পারেনি । তথাপি আমার মনে হয়, পরবর্তীকালের একটি রচনা আমরা একালেই পেয়ে গেছি । সেদিক থেকে বিজয় তেন্ডুলকার সমকালীন মারাঠি থিয়েটারকে অনেকটাই এগিয়ে দিয়েছেন ।

অনেকে তেন্ডুলকারের নামের সঙ্গেই খানোলকারের নাম উচ্চারণ করেন । এটা নিছক পদবির অনুপ্রাসিক মিলের জন্য ভাবলে ভুল হবে । অসাধারণ কবিত্ব শক্তি নিয়ে চিন্তামণি ত্র্যম্বক খানোলকার মারাঠি মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করেন । সত্যি কথা বলতে কি কবি হিসাবেই সি টি খানোলকার মারাঠি সাহিত্যে আবির্ভূত হয়েছিলেন । বাঙলা সাহিত্যে যেমন মোহিত চট্টোপাধ্যায় । পরে নাট্যকার হিসেবেই অধিক পরিচিতি পান । তাঁর ‘রাজরক্ত’ মারাঠি ভাষায় অনুদিত । খানোলকারের নাটকে লোকনাট্যের প্রচলিত ঐতিহ্য তাঁর অসাধারণ কবিত্ব শক্তির স্পর্শে মারাঠি নাট্যসাহিত্যের এক অভূতপূর্ব দিগোন্মোচন করে। মানুষের অখন্ডজীবন প্রবৃত্তির বিচিত্র রূপ ও রঙ্গে যেভাবে সমাকীর্ণ হয়ে আছে , গভীর এক অধিবাস্তব প্রত্যয়ে খানোলকার তাকে ধরতে চেয়েছেন । নিছক শূন্যতার মধ্যে তিনি কোনও কল্যাণ দেখেননি। ‘এক শূন্য বাজিরাও’ নাটকে তাই আমরা দেখি, নিঃসঙ্গ বাজিরাও ব্যর্থতার মধ্যে সার্থকতা, আর শূন্যতার মধ্যেই পূর্ণতার সন্ধান পায় । ‘অবধ্য’ বহু আলোচি ত নাটক , অশ্লীলতার অভিযোগেও চিহিত। মানব প্রবৃত্তির দ্বন্দ্ব ও সংঘাতকে এখানে চরম নাটকীয়তায় তুলে আনা হয়েছে । প্রধান চরিত্র এক সাহিত্যিক। ভালবাসার নির্মল পবিত্রতায় প্রেমিকাকে পাওয়ার বাসনা আর জৈবিক তাড়নায় তাকে কলঙ্কের মহাপঙ্কে নামিয়ে আনার দুই বিপরীত সংঘাতে জর্জরিত সাহিত্যিক শেষ পর্যন্ত প্রেমিকাকে পরিত্যাগ করে আত্মহত্যা করবেন। তবে তার চৈতন্যের ইতিবাচক দিকটি প্রভাবিত করে হোটেলের এক ভৃত্যকে । যা নেতিবাচক হতে পারত, এইভাবে তা ইতিবাচক হয়ে ওঠে । মারাঠি নাট্যবেত্তারা খানোলকারের প্রতিভার স্বীকৃতি দিয়েও নাট্যকার হিসাবে তাঁর প্রতি শ্রুতি পূরণ হয়নি বলে অভিমত পোষণ করেন ।

মহেশ এলকুঞ্চওয়ারের বেলায় কিন্তু একথা প্রযোজ্য নয় । ‘সত্যকথা’ নামক একটি পত্রিকায় কয়েকটি একাঙ্ক নিয়ে মহেশ আত্মপ্রকাশ করেন। ‘দ্রবর্ষ’ তাঁর প্রথম দিকের পুণার্ঙ্গ নাটক । ১৯৬৮ সালে মঞ্চস্থ হয়। কিন্তু জনপ্রিয়তা অর্জনে ব্যর্থ হয়। পরে ‘হোলি ’, ‘গার্বো’, ‘এক মহতার্য চা খুন’ প্রভৃতি নাটক এলকুঞ্চওয়ারকে অনিবার্যভাবে প্রতিষ্ঠা এনে দেয়। একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং পরীক্ষামূলক মনোভাব মহেশকে বিশিষ্ট করেছে । নরনারীর দৈহিক সম্পর্কের প্রশ্নে এই নাট্যকার রক্ষণশীল দলভুক্ত নন। এজন্য তাঁর নাটকও অনেক সময় সেন্সর প্রথা ও সমালোচকদের কৃপাদৃষ্টি থেকে বঞ্চিত হয়েছে । সম্ভবত ‘বাসনাকাণ্ড’-ই তাঁর সর্বাধিক আলোচিত নাটক । ‘পার্টি ’তে সমাজের উঁচুতলার মানুষ জনদের অর্থহীন জীবনচর্যার সঙ্গে তথাকথিত সভ্যতার এক রূপচিত্র অঙ্কনের চেষ্টা আছে । কিন্তু ‘বাসনাকান্ড’-র গভীরতা ও ধ্রুপদী বৈশিষ্ট্য সেখানে অনুপস্থিত । টলস্টয়ের ‘দি পাওয়ার অব ডার্কনেস’ আমরা বাঙলা মঞ্চে দেখেছি ‘পাপপুণ্য’ নামে । অমিত শক্তিধর নট-নাট্যকার ও পরিচালক অজিতেশ বন্দ্যোপাধ্যায় মানবজীবনের গভীর গোপন সত্যের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে মানুষের বিবেককে অবলীলায় স্তব্ধ করে দিতে পেরেছিলেন সে নাটকে । বিষয়বস্তুর দিক থেকে ‘ দি পাওয়ার অব ডার্কনেস ’ -এর সঙ্গে ‘বাসনাকান্ড’-র মিলের চেয়ে অমিলই বেশি। মিল এটুকুই যে এখানেও এক বিকৃত যৌন জীবনচর্যার ঘটনা আছে । আর গুত্তর অমিল এই যে কুসংস্কারাচ্ছন্ন এক অন্ধ ধারণাকে আশ্রয় করে নাটকীয় ক্লাইম্যাক্সে পৌঁছাতে হয় । অবদমিত দৈহিক বাসনা ও প্রচন্ড আবেগসর্বস্ব যুবতী ললিতা তার পিতৃ-পিতামহের ভগ্ন ও পরিত্যক্ত প্রাসাদের মধ্যে সর্বস্ব সমর্পণ করে যার কামনার হুতাশানে ,

সে ঘটনাচক্রে তারই অগ্রজ, শিল্পী, হেমকান্ত। কিন্তু বংশে ওদের নির্যাতিতা মায়ের অভিশাপ ছিল যে কারও কোন সন্তান বাঁচবে না। হেমকান্ত ইন্দ্রিয় সুখকেই চরম সত্য বলে মানে, অতএব পাষাণগাত্রে ললিতারই অনাবৃত শরীরের চিত্র এঁকে যায়। মায়ের অভিশাপ নিয়তির অমোঘ অনুশাসনের মতো নেমে আসে। ললিতা এক মৃত সন্তান প্রসব করে। ভয়ঙ্কর এক পাপবোধ এবার ললিতাকে অক্টোপাশের মতো জড়িয়ে ধরে। সে তার ক্লেদাক্ত শরীরটাকে সবার হাতে তুলে দিয়ে প্রায়শ্চিত্ত করতে চায়। প্রচন্ড মানসিক সংঘাতে উন্মত্তপ্রায় ললিতা প্রাসাদে আগুন ধরিয়ে দেয় যাতে নিজের সঙ্গে হেমকান্তও ধ্বংস হতে পারে। বেদনা ও পাপপুণ্যের এক ভয়ঙ্কর অনুভূতি শ্বাস রুদ্ধ করে রাখে দর্শককে। অনুতাপের আগুনে দগ্ধ দুই নরনারী যখন দর্শকের সামনে এসে দাঁড়ায় তখন অনিবার্যভাবেই 'পাওয়ার অব ডার্কনেসে'র কথা মনে পড়তে পারে। প্রাগৈতিহাসিক বাসনার সর্বগ্রাসী রূপ ও সত্যের চিরন্তন সংঘাতে 'বাসনাকান্ড' একটি বড় মাপের নাটক হিসাবে পরে স্বীকৃতি লাভ করেছে। মহেশের 'হোলি', 'পার্টি' এবং 'ওয়াড়া চিরেবন্দী' (উত্তরাধিকার) বাঙলা রঙ্গমঞ্চেও যথেষ্ট সাড়া জাগিয়েছে।

মারাঠি একাঙ্ক নাটকের ক্ষেত্রে বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য বিদ্যাধর পুন্ডলিক, বসুধা পাতিল ও রত্নাকর মাতকারির নাম। শেষোক্ত জনের উপর তেন্ডুলকারের প্রভাব সুস্পষ্ট। বিদ্যাধর পুন্ডলিকের একাঙ্ক নাটক 'চক্র' পরবর্তী সময়ে 'মাতা দ্রৌপদী' নামে পূর্ণাঙ্গ রূপ পেলে অশেষ খ্যাতি অর্জন করে। প্রসঙ্গত, আজকের মারাঠি থিয়েটার যাঁদের নাট্যরচনায় পুষ্টিলাভ করেছে তাদের মধ্যে আরও কিছু উল্লেখযোগ্য নামঃ

বসন্ত কানেতকার ঃ (উল্লেখযোগ্য নাটক — 'ভেড়াচা ঘর উনহাট', 'প্রেম তুঝা রঙ কাসা', 'রায়গড়াল্যাজেভা জাগইয়েতে', 'মৎস্যগন্ধা', 'মোহিনী', 'হিমালয় চি সাবলি', 'ইথে ওসালা মৃত্যু')।
এস.এন.পেন্ডসে ঃ ('যশোদা', 'গরমবিচা বাপু', 'সোনার বাঙলা', 'শম্ভু সাচা চালি')
এস. জি. শাঠে ঃ ('সপনিচে হেধন', 'শসা আমি কাসব',)
গঙ্গাধর গ্যাডগিল ঃ ('জোছনা আনি জ্যোতি', 'স্নেহর সিপাহী')
বসুন্ধরা পট্টবর্ধন ঃ ('এহরকানি')
পুষোত্তম দারভেকার ঃ (চন্দ্র নভিচা ঢল্ল্', 'নয়ন তুঝে যাদুগর')
ভি. ভি. শিরওয়ড়কর ঃ ('বৈজয়ন্তী' 'বিদুষক', 'নটসম্রাট', যযাদি আনি দেবযানী')
এম. জি. রঙ্গনেকার ঃ ('মাঝে ঘর', 'কুলবধূ', 'আশীর্বাদ' 'এক হোতা মা তারা')
পি. কে. আত্রে ঃ ('মী মন্ত্রী ঝালো', 'বয়া তেথে বায়া', 'পাণিগ্রহণ', 'বক্ষ্মচারী', তো মী নভেচ', 'সাষ্টাঙ্গ নমস্কার')
বিদ্যাধর গোখলে ঃ ('মন্দারমালা', 'মেঘমল্লার', 'স্বরসম্রাজ্ঞী')
জি.পি.দেশপাণ্ডে ঃ ('উদ্বাস্তু ধরমশালা')
অচ্যুত ওয়াজে ঃ ('সোফা কাম বেড', 'চলরে ভোপলা টুনুক টুনুক')
বৃন্দাবন দন্ডবতে ঃ ('এক রাজা কা খেল')
তারা ওয়ানারসে ঃ ('কাকসা')
মঙ্গেশ পাটকি ঃ ('উদ্ধব')
সরিতা পাটকি ঃ (' রাধা')
সাই পরাঞ্জিপে ঃ ('সখ্খে সিজারি')
অনিল বার্ভে ঃ ('থ্যাঙ্ক ইউ মিঃ গ্লভ', 'হামিদা বাই চি কুঠী')

সাম্প্রতিক কালের দুই শক্তিমান নাট্যকার জয়বন্ত দলভি এবং সতীশ আলেকারের কথা না বললে এ আলোচনা অসম্পূর্ণ থেকে যাবে। বয়সে খুব নবীন না হলেও দুলভির নাটক নব্যযুগের বিদ্রোহী চৈতন্যে পরিপুষ্ট। তাঁর 'সূর্যাস্ত' বছর কয়েক আগে কলকাতার দর্শক বাঙলা ভাষায় দেখেছেন। মহারাষ্ট্রে নাটকটি প্রযোজনা করেন বিখ্যাত অভিনেতা- নির্দেশক নীলু ফুলের নিজস্ব নাট্যসংস্থা নট্যের। নাটকটির কাহিনী সমকালীন সমাজ ও রাজনীতির জটিল আবর্তে প্রতিষ্ঠিত। আপ্পাজী (নীলু ফুলে) একজন প্রাক্তন স্বাধীনতা সংগ্রামী। একসময় নেহের সঙ্গে জেল খেটেছেন। দেশের স্বাধীনতার জন্য তিনি ও তাঁর স্ত্রী (সুমন ধর্মাধিকারী) অনেক ত্যাগ স্বীকার করেছেন। এহেন আপ্পাজীর পুত্র বালাসাহেব (মুকুন্দ গোখলে) রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী হয়ে সীমাহীন দুর্নীতি ও স্বেচ্ছাচারের স্রোতে রাজ্যকে ভাসিয়ে দিয়েছেন। অনিবার্যভাবেই নাটকীয় সংঘাত গড়ে ওঠে পিতার সঙ্গে পুত্রের, প্রকৃত গান্ধীবাদীর সঙ্গে মেকী গান্ধীবাদীর। পরিণামে মুখ্যমন্ত্রীর যাবতীয় কু-কর্মের নায়ক শান্তারামের (দীনেশ করমরকার) হাতে নিহত হন আপ্পাজী। বেতারে প্রচার হয়, তিনি আত্মহত্যা

করেছেন।নাটকটি বোম্বাই, পুণা, নাসিক, নাগপুর যেখানেই অভিনীত হয়েছে অসাধারণ দর্শক আনুকূল্য পেয়েছে।পুণাতে পরিপূর্ণ প্রেক্ষাগৃহে নাটকটি দেখার পর কলকাতায় এসে আলোচনা লিখেছিলাম (গ্রুপ থিয়েটার/ বর্ষ ৬ সংখ্যা ৩/১৯৮৪)। এরপর কলকাতারই নাট্যসংস্থা ভূমিকা নাটকটির বাঙলা রূপান্তর উপস্থাপিত করে (১৯৮৬)। এখানে পুনরাবৃত্তি না করে যেটুকু বলার তা হল বর্তমান ভারতবর্ষের রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে গান্ধীবাদকে যারা মুখের বুলিতে পরিণত করে একটি অন্তঃসারশূন্য নিষ্ঠুর গদির রাজনীতি কায়েম করেছে, দল্‌ভি নিটোল এক গল্পের মাধ্যমে পরম নির্মমতায় তাদের নির্মোক উন্মোচন করেছেন। 'সূর্যাস্ত' সেদিক থেকে একটি নির্ভেজাল রাজনৈতিক নাটক। এবং প্রসঙ্গত একথাও মানতে হবে যে দেশের আর্থ-সামাজিক সমস্যা এবং সমকালীন রাজনৈতিক জটিলতার বুদ্ধিদীপ্ত প্রতিফলন নিঃসন্দেহে আজকের মারাঠি থিয়েটারকে সমৃদ্ধ করেছে। 'ঘাসিরাম কোতোয়াল', 'সূর্যাস্ত', কিংবা 'কমলা' কোনটাই অরাজনৈতিক চিন্তার শিল্পবাদী ফসল নয়। ভরত নাট্য সংশোধন মন্দির প্রযোজিত 'সম্ভবামি যুগে যুগে' মহাভারতের কাহিনী নিয়ে রচিত হলেও তার স্যাটায়ারের মধ্যে ভারতীয় রাজনীতির প্রতিফলন আছে। তবে মহাভারতে শকুনির মস্তক মুন্ডন আর একালের চরণ সিং রাজনারায়ণদের প্রতিজ্ঞা ও ক্রিয়াকলাপের যোগসূত্র এত সূক্ষ্ম যে সাধারণ দর্শকের পক্ষে সম্যক অনুধাবন করা কঠিন। তবু নাটকটির উপস্থাপনা দেখে এই সিদ্ধান্তে আসা যায়, মারাঠি নাট্যকার নির্দেশকেরা পৌরাণিক ঘটনাবলীকে বর্তমান সময়ের সামাজিক রাজনৈতিক প্রেক্ষাপটে ফেলে যেভাবে ব্যবচ্ছেদ ঘটাতে চান তা শুধু তাৎপর্যময় নয়, থিয়েটারের সামগ্রিক পরীক্ষা নিরীক্ষা ও অগ্রগতির প্রশ্নে নিঃসন্দেহে প্রগতিশীল।

আবার মলাটের অন্য পিঠও আছে। যেমন বসন্ত সাবনিসের 'আপ্পাজী চি সেক্রেটারি'। পুণার কলাকার প্রযোজিত এবং রাজা নাটু পরিচালিত এই প্রহসনের দুই মলাট - চরিত্র আপ্পাজী ও তার সেক্রেটারির ভূমিকায় যথাক্রমে শারদ তলোয়ারকর এবং শশা কলার তুখোড় অভিনয় ছাড়া পাবার কিছু থাকে না। শরীরী তাড়নায় অস্থির এক প্রৌঢ়ের নবনিযুক্ত যুবতী সেক্রেটারিকে নিয়ে স্থূল ভাঁড়ামোই - এ নাটকের উপজীব্য। এক শ্রেণীর দর্শক আজও ঐতিহ্য সূত্রে এ ধরনের সুড়সুড়িতে আরামবোধ করে এবং প্রেক্ষাগৃহ পূর্ণ করে দেয়। এরকমই হালকা চালের আর এক প্রহসন শিবরাজ গোড়লের লেখা 'কুরিয়াত সদা তিঙ্গলম' (নির্দেশনা বি.সি.পানসে)। এসব দৃষ্টান্ত উল্লেখ করার প্রাসঙ্গিকতা এটুকুই যে, আধুনিক মারাঠি থিয়েটারে সনাতন তামাশা -র প্রভাব এখনও বর্তমান আছে একথা ভুললে চলবে না। সত্তরের দশকে মারাঠি রঙ্গমঞ্চে সতীশ আলেকারের আবির্ভাব বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ১৯৭১ সালে 'জুলতা পুল' (ঝুলন্ত সেতু) নামে একটি একাঙ্ক নিয়ে প্রথম প্রবেশ। প্রবেশমাত্রই অসামান্য সাফল্য। আন্তঃকলেজ একাঙ্ক প্রতিযোগিতায় 'জুলতা পুল' ২২ বছরের তণ সতীশের জন্য নিয়ে এল চার চারটি শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। শ্রেষ্ঠ নাটক, শ্রেষ্ঠ প্রযোজনা, শ্রেষ্ঠ নির্দেশনা ও শ্রেষ্ঠ অভিনয়। সেই থেকে মহারাষ্ট্রের এই নবীন প্রতিভা আর পেছনে তাকাবার অবসর পাননি। এক দশকের মধ্যেই তিনি লিখলেন ছটি পূণার্ঙ্গ ও আটটি একাঙ্ক নাটক। পুণার থিয়েটার আকাদেমির প্রথম দশটি প্রযোজনার পাঁচটিই সতীশের। 'মিকি আনি মেমসাহেব' (১৯৭৩) 'মহানির্বাণ' (১৯৭৪) 'বেগম বার্ভে' (১৯৭৯) ও 'শনিবার রবিবার' (১৯৮২) নিজেই পরিচালনা করেন। বাকি 'মহাপুর' (১৯৭৫)-এর পরিচালনায় ছিলেন মোহন গোখলে। পাঁচটি নাটকের প্রধান চরিত্রে অভিনয় করেন যথাক্রমে (১) মোহন আগাসে— মোহন গোখলে (২) চন্দ্রকান্ত কালে — সতীশ আলেকার (৩)রমেশ মেধেকার — চন্দ্রকান্ত কালে, (৪) চন্দ্রকান্ত কালে — শোভা পাটকি (৫) মোহন গোখলে —মঞ্জরী পরাঞ্জিপে। এর মধ্যে দুটি নাটক কলকাতার দর্শক দেখেছেন 'বেগম বার্ভে' (নান্দীকার আয়োজিত জাতীয় নাট্যমেলায়) এবং 'মহানির্বাণ' (অনসম্বলের প্রযোজনায় সোহাগ সেন পরিচালিত বাঙলা রূপান্তর)। থিয়েটার আকাদেমি পরে সতীশের আরও দুটি নাটক প্রযোজনা করে 'প্রলয়' (১৯৮৫) এবং 'অতিরেকি' (১৯৯০)। ১৯৯০ সাল পর্যন্ত থিয়েটার আকাদেমির প্রযোজনায় আরও যে উল্লেখযোগ্য নাটকগুলি দেখা যায় তা হল, বিজয় তেন্ডুলকারের 'ঘাসিরাম কোতোয়াল' (১৯৭৩) 'ভাউ মুরারাও' (১৯৭৬), সুহাস টেম্বের 'বীজ'(১৯৭৫), রাজারাম হাসনের 'খেলিয়া' (১৯৭৬), পি. এল. দেশপান্ডের 'তিন পয়সা চা তামাশা' (১৯৭৭), অশোক সাহানের 'ফরারী' (১৯৭৭), মিনা দেশপান্ডের 'ডলস্‌ হাউজ' (১৯৮০), অণ সাধুর 'পদগাম' (১৯৮৫), অতুল পেধের 'ক্ষিতীজ' (১৯৮৬), মাধুরী পুরান্দারের 'আবদা আবদা' (১৯৮৭), শ্রীরঙ্গ গোড়বলের 'মেক আপ' (১৯৮৭) ও মকরন্দ শাঠের 'সপতনে কারাচে মূল' (১৯৮৯)। এর মধ্যে 'খেলিয়া', 'তিন পয়সা চা তামাশ', 'ফরারী', 'ডলস হাউজ' এবং সতীশের 'প্রলয়' অবশ্য মৌলিক নাটক নয়। রত্নাকর মাতকারির উপন্যাস অবলম্বনে সতীশের দুই অঙ্ক বিশিষ্ট নাটক 'ছাপা' আর একটি উল্লেখযোগ্য নাটক।

ডঃ দিলীপ মিত্র একটি নিবন্ধে আধুনিক কালের প্রথম নাটক হিসেবে পি. এল. দেশপান্ডের 'তুঝে আহে তুঝাপাসি' নাটকটির নামোল্লেখ করেছেন। ১৯৮৩ সালে পুণায় তাঁর বাড়িতে এক সাক্ষাৎকারে সতীশও আমাকে বলেছিলেন পঞ্চাশের দশক থেকেই মারাঠি নাটক তার সাহিত্যিক গন্ডি পেরিয়ে সত্যিকারের ভিসুয়াল আর্ট হিসাবে আত্মপ্রকাশ করতে থাকে। আঙ্গিকের পরিবর্তে বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য এবং ক্রমবর্ধমান পরীক্ষা-নিরীক্ষার পরিপ্রেক্ষিতে পঞ্চাশের দশকই মারাঠি থিয়েটারের প্রকৃত আধুনিকতার দশক (আজকাল/১২

ফেব্রুয়ারি, ১৯৮৩)। মারাঠি নাট্যসাহিত্য ও থিয়েটারের ক্রমবিকাশের ধারা পর্যবেক্ষণে আমি এই বক্তব্যের সঙ্গে দ্বিমত নই। কারণ মামা ওয়ারেরকার থেকে যে দৃষ্টিভঙ্গির সূত্রপাত, তারই সংহত ও প্রাগ্রসর রূপ দেখতে পাই আমরা পুলা দেশপান্ডে বসন্ত কানেতকারদের হাতে পঞ্চাশের দশকে। তারই ধারাবাহিকতা পথ পরিক্রমায় সত্তর দশকে উঠে আসেন বিজয় তেন্ডুলকার। এঁরা প্রত্যেকেই মারাঠি থিয়েটারের গতিপথে এক একটি গুরত্ব পূর্ণ মাইলস্টোন। সতীশ এবং সমসাময়িকদের হাতে আধুনিক মারাঠি নাটক তার সংহত নিটোল রূপটি অন্বেষণে তৎপর। সতীশ আলেকার সম্পর্কে একসময় পুণা ঝিবিদ্যালয়ের সাংবাদিকতা বিভাগের রিডার ডঃ পি.এন. পরাঞ্জপে বলেছিলেন, ‘ The Marathi theatre, and probably the Indian theatre as a whole, has been steadily moving away from the dominance of the literary and melodramatic idiom in theatre toward an awareness of the theatre as a vehicle of self expression and as a performing art. Alekar is the first Marathi playwright, who seems to explore consciously the potentialities of this concepteral awareness and forge a new path. Alekar’s instinct and understanding of the dramatic and the success he has achieved have, therefore, to be regarded as an important milestone in the evolution of the Marathi theatre’. এতটা উচ্ছসিত না হয়েও আমরা বলতে পারি, সমাজ ও জীবনের গভীরতর জটিল চিত্র অঙ্কন করতে গিয়ে সতীশ যে সূক্ষ্ম অনুভব, ভাষা ও ভাবের পরিমিতি এবং সর্বোপিরি থিয়েটারবোধের পরিচয় দেন তাতে তেন্ডুলকার পরবর্তী নাট্যকারদের মধ্যে তিনি বিশেষভাবে আলোচিত ও সম্মানিত হওয়ার দাবি রাখেন। সতীশের নিজের কথায়, সত্তর দশক মারাঠি থিয়েটারের ইতিহাসে এক গুত্বপূর্ণ যুগ, সন্ধি।

পরিশেষে, এত কথার পরেও, এ কথাটা অবশ্যই মনে রাখতে হবে যে আপামর মানুষের জন্য মারাঠি থিয়েটারের এখনও সীমাবদ্ধতা অনেক । তার গতি বড়জোর তালুক (জেলা) স্তর পর্যন্ত । গ্রামাঞ্চলে তামাশা আর হিন্দি সিনেমাই বিনোদনের প্রধান মাধ্যম । ফলে গ্রাম ও শহরের মধ্যে একটি দুস্তর সাংস্কৃতিক ব্যবধান রয়ে গেছে । সত্তর দশক থেকে দলিত নাট্যকর্মীরা এই ব্যবধান কমিয়ে আনার জন্য নাট্যচর্চাকে একটা আন্দোলনের রূপ দিতে সচেষ্ট । নগর বস্তি থেকে মফস্বল পর্যন্ত এঁরা নাট্যাভিনয় পৌঁছে দিতে চান । বি. এস. সিন্ধের ‘আয়োগ’, ‘কালো খিয়া গড়ভাত’, প্রকাশ খোড়ের ‘মিনাক্ষীপুরম’, টেক্সাস গাইগোয়াড়ের ‘আমহি দেশ সাচে মারি কারি’ ইত্যাদি এই সময়ের বুদ্ধিদীপ্ত প্রযোজনা। পুণার দলিত রঙ্গভূমি যদিও দ্বিখন্ডিত তথাপি দলিত নাট্যকর্মীদের সচেতন সংগ্রামী প্রয়াস মহারাষ্ট্রের নাট্যপ্রবাহে এক নতুন বেগের সঞ্চার করেছে সন্দেহ নেই ।